মাহমুদুল হক সিরিজ ১

পতঙ্গ সমাচার

©

বারোমাসি প্রকাশনী

পতঙ্গ সমাচার

তৌফিক আশরাফ

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ :

লেখক ও প্রকাশকের যৌথ অনুমতি ব্যতীত এই বই বা বইয়ের কোনো অংশবিশেষ ই-বুক বা অনলাইনে প্রকাশ করা যাবে না এবং কোনো যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই ঘোষণা লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বারোমাসি প্রকাশনী
প্রকাশক
মিঁয়া মোহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ ফয়সল

পতঙ্গ সমাচার
তৌফিক আশরাফ
গ্রন্থস্বত্ব©লেখক
প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৪৩১
ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
শাবান, ১৪৪৬
প্রচ্ছদ : সাহাদাত হোসেন

POTONGO SOMASAR
TOUFIQ ASHRAF
Copyright ©Toufiq Ashraf
মুঠোফোন : ০১৯৭১ ৬১ ১২ ১২
অক্ষরবিন্যাস, অলংকরণ :
বারোমাসি
মুদ্রাক্ষরিক : লেখক

মুদ্রণ : রিমা ট্রেড, ৪১২/বি, গাউসুল আজম সুপার মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র : বারোমাসি, নাগড়া ফুটব্রীজ, নেত্রকোনা
বিক্রয়কেন্দ্র ১ : বারোমাসি, কদম খাঁ গলি, মিতালি রোড, ঝিগাতলা, ঢাকা
বিক্রয়কেন্দ্র ২ : বারোমাসি, বাড্ডানগর লেন, হাজারীবাগ পার্ক সংলগ্ন, ঢাকা

বিনিময় মূল্য : তিনশত টাকা মাত্র **: US $ 3**
ISBN: 978-984-98625-7-4

ঘরে বসে, কম খরচে এবং বিভিন্ন প্যাকেজ ও বাহারি ছাড়ে যেকোনো প্রকাশনীর বই কিনতে যোগাযোগ :
www.facebook.com/baromashi
www.facebook.com/baromashiprokashoni

উৎসর্গ

আমার ভ্রাতৃপ্রতীম বন্ধু—
মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম সোহান

যত দূরেই থাকো, কাছেই আছো।

সূচি

পতঙ্গ সমাচার/ ০৯
চাপ/ ৪৯
অসীম সংকেত/ ৮৬

মাহমুদুল হক সিরিজ

পতঙ্গ সমাচার

তৌফিক আশরাফ

১

গত দুই সপ্তাহ ধরে সেই যে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছিল, আর থামাথামির নাম নেই। চায়ের দোকানের পাটাতন গড়ানো পানির ফোঁটা টুপ টুপ করে পড়ছিল নর্দমার উপচে পড়া পানিতে। রাস্তাঘাটে রীতিমত হয়েছিল বিল-ঝিল, যার থৈ থৈ পানি হঠাৎ করে ফোয়ারা দিয়ে চলমান গাড়িকে স্বাগত জানাত।

বাতাস দিচ্ছিল। বিকেলের গুমোটের দিকে তাকিয়ে ছিল কাক, ঘাড়ের ভেতর মাথাটা ঢুকিয়ে চারদিক পর্যবেক্ষণ করছিল। ধীরগতিতে চলতে থাকা ছোটখাট মিনিবাসের ভেতরে লোক কম, চৌদ্দজন মাত্র। যাচ্ছে মতিঝিল টু রামপুরা রুটে।

মিনিবাসের যাত্রীদের মধ্যে মাত্র দু'জন মহিলা, তারা মহিলা সিটে না বসে সাধারণ যাত্রীদের সিটে বসা ছিল। আরও ছিল এক মৌলভী, অসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে দেখছিল পাশের সিটের তরুণ ছোঁকড়াকে; কিছুক্ষণ পরপর যে চুল ঠিক করে মহিলাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছিল। তিনজন মাঝবয়সী চাকুরিজীবী, সামনের সিটে ড্রাইভারের ঠিক পিছনে বসা এক লোক, সবার পিছনের সিটে আরেক সরুমতন লোক। সবার চেহারা ছিল গম্ভীর, বৃষ্টির দিনে যদি আকাশে ভারি মেঘের জন্য নিচের শহরে গুমোট অন্ধকার রাজত্ব করে, তবে কারো মুড তো ভালো থাকার কথা না।

গুলিস্তানে থেকে আগত বাস ধীরগতি জ্যাম পেরিয়ে চলে এল শান্তিনগর। ঐ সময় বাসে উঠে গেল আরো দু'জন যাত্রী। নারী ও পুরুষ, সম্ভবত জোড়া শালিক। শান্তিনগরের বড় রাস্তা পেয়ে ছুটে গেল জ্যাম, গতি বাড়ানো হল। মালিবাগ মৌচাক পেরোল অনায়াসে। একটান দিয়ে চললো সরাসরি রামপুরা।

মোড়ে ফলের দোকান ছিল, মাছি-টাছি গিজগিজ করছিল ওগুলোর চারপাশে। বাসের জোড়া শালিক যাত্রীদ্বয়ের গায়ে পারফিউমের ঘ্রাণ পেয়ে কয়েকটা মৌমাছি তখন বাসের পিছন পিছন উড়াল দিল। এমনকি যাত্রীদের কানের পাশ দিয়েও ভন-ভন শব্দে উড়ে গেল। বিরক্ত লোকজন তখন বাসের জানালাগুলো বন্ধ করার উদ্যোগ নিল। আর অঘটনের জন্য দায়ী দুই তরুণ-তরুণী এতে বেশ মজা পেয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল।

মিনিবাস চলে এল রামপুরা, হেলপার ছোকড়া গদাই লস্করী ভাব নিয়ে ঘোষণা করলো, "গাড়ি আর যাইবা না, রামপুরা নামেন, রামপুরা ছেন্টার!"

গাড়ি ঘুরে ইউ-টার্ন দিয়ে রাস্তার অপরপাশে রওনা দিল। যাত্রীরা উঠে দাঁড়িয়ে গেটে জড়ো হতে লাগল, নেমে যাবার সময় এসে গেছে। সামনের সিটের যাত্রী তখনো সেভাবেই বসে ছিল। তার কাছে এগিয়ে এল হেলপার, "বড়ভাই, গাড়ি আর যাইতো না, নামেন। আর ভাড়াটা বাকি আছে, ভাড়াডা দেন।"

কিন্তু লোকটা আগের মতই সেভাবেই বসে ছিল।

"ভাই, ভাড়াটা দেন তো।" তাগাদা দিল হেলপার।

কোন সাড়া এল না।

ততক্ষণে ঘুরে গেল মিনিবাস, স্থির হয়ে দাঁড়াল। সামনের দিকে ঝুঁকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকটা। নেমে যেতে প্রস্তুত যাত্রীরা শব্দ শুনে ঘুরে তাকাল, হাঁ করে চোখ কপালে তুলল হেলপার। লোকটা বেশি হলে চার মিনিট আগে মারা গেল।

***

বাজারের শোরগোল পিছনে ফেলে বাসার দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন মাহমুদুল হক। রিক্সা নিতে ইচ্ছা করছিল না, যদিও পথ ছিল যথেষ্ট দীর্ঘ। তবে একদিক থেকে ভালোই হলো, বাসায় যাবার পথে ভালো কোন জিনিস পেলে কেনা যাবে। আজ ছিল বৃহস্পতিবার, কাল ছুটির দিন। হয়তোবা এই সন্ধ্যায় তার পুরনো বন্ধু ফয়সাল মাহমুদ বাসায় আছেন।

হাঁটতে হাঁটতে তিনি চলে এলেন মিরপুর রোডের কলাবাগান বাসষ্ট্যান্ডে। সন্ধ্যায়ই যেন ঢাকা শহরের আসল জীবন আরম্ভ হয়, দিনের বেলা নয়। মানুষের ভিড়, গাড়ির ভিড়। কিছুদূর গিয়ে একটা ছোটখাট বইয়ের দোকান পাওয়া গেল, তার সামনে থামলেন। বইয়ের সারি ছিল একেবারেই ছোট, দেখার মত কিছু নেই, স্টলে বেশিরভাগ জায়গা দখল করে আছে পত্রিকা। তবু এক কোণায় ছোট বই দেখা গেল, সবুজ মলাটের। "ওটা দেখি তো।" হাত দিয়ে দেখালেন। গোমড়ামুখো তরুণ দোকানী তাক থেকে বইটি নামিয়ে মাহমুদ সাহেবের হাতে দিলো। উল্টেপাল্টে দেখলেন তিনি। রুশ মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ভ্লাদিমির লেভির লেখা "অস্বাভাবিক শিশু"। কেন যেন এই বইটা তাঁর পছন্দ হলো, কিনে নিলেন। ফের হাঁটতে হাঁটতে একচোট হেসে নিলেন

মাহমুদুল হক সিরিজ

চাপ

তৌফিক আশরাফ

১

শরতের আবহ শেষে উঁকি দিচ্ছিল শীতের হালকা আভাস। এই সকালে রীতিমত অল্প অল্প কুয়াশা পড়তেও আরম্ভ করেছিল ধানমন্ডির এই কোণায়, নতুন গজানো শপিং মলের চারদিকে গিজগিজ করছিলো যানবাহন আর মানুষে। রাস্তার ধারে সারি ধরে দাঁড়ানো ছিল গাড়ি, ধীরগতিতে এগিয়ে এল ময়লার ট্রাক, সেটা থেকে নামল চল্লিশোর্ধ এক পরিছন্নতা কর্মী। ট্রাক চলে গেল।

শপিং মলে ঢুকছিলো, বেরোচ্ছিলো কাষ্টমার সহ আরো লোকজন, পরিছন্নতার লোকটা রাস্তার ওপার থেকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। যেন ক্রেতাদের মাঝে কাউকে খুঁজছে। চেহারায় স্থির অপেক্ষা। তবে কিছুটা জ্যান্ত হয়ে উঠেছিলো চাহনি, যখন দেখা গেল মালামাল নিয়ে নিজের গাড়ির দিকে যাচ্ছে একজন মধ্যবয়সী লোক। চারদিকে হাজারো মানুষের মাঝে তাকেই দেখছিলো ক্লিনার। হঠাৎ রাস্তার ট্রাফিক উপেক্ষা করে এগোতে লাগল সে, দ্রুত পেরোতে লাগল রাস্তা। গাড়ি তখনও রওনা দেয়নি, মোবাইলে কারোর সাথে তর্ক করছিলো গাড়ির মালিক। গাড়ির পিছনে ঘেঁষে দাঁড়ালো ক্লিনার, গাড়ির পিছনের ট্রাংকে হাত রাখলো। ট্রাংকের ফাঁক খুঁজে বেড়াচ্ছিল তার অযত্নে চামড়া উঠা আঙ্গুল।

***

বাংগাউ এন্টারপ্রাইজ-এর অফিস খোলা রাত দশটা পর্যন্ত, এই নিয়ম শুরু থেকেই চালু করেছিলেন মাহমুদুল হক। টিমের বাকিরা চলে যেত সন্ধ্যা ছয়টায়, কোন কোন দিন সবার আসা লাগতোও না। অ্যাকাউন্টসের দায়িত্বে ছিল রওনক। টিমের প্রধান মুখপাত্র রানা থাকতো রাত আটটা অবধি। পরে তারাও চলে যেত, কিন্তু মাহমুদ সাহেব পুরোটা সময় থাকতেন। বাসায় যাবার তাড়া ছিল না, মেয়ে শিরিন আগামীকাল ভোরে ফেরত চলে যাবে যুক্তরাষ্ট্র। একপ্রকার তার সাথে বিদায় নেয়া হয়েই গেছে।

আনমনে দু'টো টেলিফোন নম্বর দেখলেন, দুই পার্টির। বাংগাউ এন্টারপ্রাইজ ছিল মাত্র কয়েকদিন আগে জন্ম নেওয়া ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান, যার যশ-খ্যাতি কিছুই তৈরী হয়নি আপাতত। প্রথম পার্টির জন্য পিকনিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল, লাভের মধ্যে এটুকুই। স্রেফ নিজের কাছে প্রমাণ করা যে, একদল আনাড়ি ছোকড়া চাইলেই পারে। আর্থিক লাভ কিছুই হয়নি, সব খরচ হয়ে গেল ব্যবস্থাপনায়। তবে প্রথমবারের মত এতে কিছু বলেনি কেউ।

দশটা পাঁচে শূন্য অফিস বন্ধ করে বাসার দিকে রওনা দিলেন মাহমুদুল হক। রাস্তায় হালকা শীত টের পাওয়া যাচ্ছিল, কমে আসছিল বাজারের হৈ-হল্লা। পথে কিছু ফল-ফাকড়া কিনলেন, কাল চলে যাবার আগে দেশের ফলের স্বাদ আরেকবার আস্বাদন

করুক শিরিন। লালমাটিয়ার বাসায় পৌঁছাতে বেজেছিলো সাড়ে এগারোটা, ততক্ষণে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, যা সাধারণত হতো না। তবে বয়সের কাছে ধীরে ধীরে হার মানতে বাধ্য হচ্ছেন তিনি।

সিঁড়িতে বরাবরই ছড়িয়ে আছে পানের ঘ্রাণ, বাড়ির দারোয়ান ফখরুল আর তার দুই স্ত্রী দিনরাত পান চিবাতো, যেন এটাই তাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য। নিজ ঘরে পৌঁছাতে পৌঁছাতে দেখা গেল, তখনো জেগে আছে শিরিন। ব্যাগপত্র গোছানো শেষ।

"ঘুমাওনি এখানো?" অবাক হলেন মাহমুদ সাহেব।

"বিমানে ঘুমানোর অনেক সময় পাবো।" হাসিমুখে বললো শিরিন, টেবিলে স্যুপের বড় বাটি রাখলো। "বিদায়ী ট্রিট খেতে বসো, ঠান্ডা হলে ভালো লাগবে না।"

"আচ্ছা।"

মাহমুদ সাহেব ঐ অবস্থায় হাত ধুতে গেলেন। টেবিলে বসে ছিল আরেকজন। পয়ঁত্রিশ বয়সী কৃষকায় আকরামুল। অতীতের মামলার সাক্ষী, যাকে নিরাপত্তার খাতিরে আগামীকাল শিরিনের সাথে বিদেশ চলে যেতে হচ্ছে। তার জন্য দেশে থাকাটা নিরাপদ ছিলো না, যেহেতু হত্যা মামলার প্রধান আসামীর জেল হলেও আর বাকি সহযোগীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ না থাকায়, তারা মুক্ত অবস্থায় ছিলো সেজন্য আকরামুলের উপর বিপদ নামতে পারতো। তাই নিজ দায়িত্বে তার বিদেশ প্রস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন মাহমুদ সাহেব আর মেয়ে শিরিন। এতোদিন ধরে মাহমুদ সাহেবের বাড়িতে আত্মগোপন করে ছিলো আকরামুল। চাকরি সহ বাসা-বাড়ি ছেড়ে দিয়ে এখন পলাতক।

তিনজন মিলে স্যুপ খেতে বসেছিলেন।

দেয়ালঘড়িতে বাজছিলো রাত বারোটা।

"তুমি বাবা কোনদিন আজকালকার চালচলন শিখতে পারবে না," অনুযোগ করছিলো শিরিন। "তোমার মত এভাবে কেউ থাকে কীভাবে? এসব ডাইনোসর যুগের আসবাব, এই দেয়ালঘড়ি, পিসি কম্পিউটার... একটা গাবদা গোবদা মার্কা জিনিস।"

"তোমার মায়ের চেয়ে ভালো আছি।" ফোঁড়ন কাটালেন মাহমুদ সাহেব।

কিছু বললো না শিরিন, খাওয়ার দিকে মন দিল।

আকরামুলের দিকে তাকালেন মাহমুদ সাহেব, বললেন, "এখান থেকেই পশ্চিমা খাবারের জীবন আরম্ভ হলো আপনার, আর ভাত পাবেন না। এখন কেবল স্যুপ আর ম্যাকারনী চলবে।"

কৃতজ্ঞ দৃষ্টি দিয়ে মৃদু হেসে উঠলো আকরামুল।

"অবশ্যই আমাকে চিঠি দিবেন। কীভাবে কী হচ্ছে, কী রকম অ্যাডজাস্ট করতে পারছেন। আর মোটেও দুশ্চিন্তা করবেন না, ওদিকে আমাদের যথেষ্ট বড় কমিউনিটি আছে। তাদের সাহায্য বরাবরই পাবেন।"

"চিঠি? চিঠি আজকাল কেউ দেয় নাকি?" পুনরায় খোঁটা না দিয়ে পারলো

মাহমুদুল হক সিরিজ

অসীম সংকেত

তৌফিক আশরাফ

১

কক্সবাজার থেকে আগত দূরপাল্লার কোষ্টার বাস যখন থামে ঢাকার শ্যামলীতে, রাত তখন আটটা। হুড়মুড়িয়ে নামে ছেলেমেয়েরা, টানাটানি চললো ট্রাভেল ব্যাগগুলো বুঝে নেবার। ক্লান্তিতে চোখ বুজে এসেছিল মাহমুদ সাহেবের, রাস্তায় দাঁড়িয়ে সবার ছুটাছুটি দেখছিলেন।

রানা বিদায় নিতে এল।

"স্যার, কাল শুক্রবার। কী করবেন?"

"ঘুমাবো।" ঘোষণা করলেন মাহমুদ সাহেব। "তোমরাও ঘুমাও কারণ পরের দিন থেকে ফের ঝামেলা আরম্ভ হবে।"

"ঠিক আছে স্যার।" রানা হাসিমুখে রিক্সা খুঁজতে রওনা দিল।

মাহমুদ সাহেব হেঁটে হেঁটেই লালমাটিয়ার বাসার গেলেন। টানা আট ঘন্টার জার্নিতে অনেক বসা হয়েছে, একটু হাটা দরকার। মাত্র মাত্র বান্দরবানে বিশাল ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রোগাম সেরে রেখেছিলো তাঁর টিম বাংগাউ এন্টারপ্রাইজ, যার সদস্যরা তাঁর সঙ্গে চলে এল ঢাকা। ডজনখানেক ছেলেমেয়ে, প্রত্যেক বেতনের উপরে বখশিশ পেয়েছে বারো হাজার টাকা করে। মাহমুদ সাহেব নিজেও পঞ্চাশ হাজার পেলেন। বড় হিসাবে কিছুই না, কিন্তু ছোট হিসাবে ভালোই। পার্টি বিবাহের অনুষ্ঠান করেছিল এমন খরচে, যাতে গোটা বান্দরবান জেলা নগদে কিনে ফেলা যেত। মানুষ পারেও।

শরতের রাতে হালকা তাজা বাতাস দিচ্ছিল, রাস্তার ভিড় ছিল ভালোই। পথে হঠাৎ পুরোনো বন্ধু ফয়সাল মাহমুদের ফোন পেলেন।

"কালকে কী করবা? কাজ আছে?"

"কিছু না, বহুদিন পর একটু রেস্ট নিবো।"

"শোনো, কাল বিকালে একটু আমার বাসায় আসো। আমার মেয়ে খুশিকে দেখতে আসবে, তাই তোমার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক চোখ আমার দরকার। আরো গেষ্ট থাকবে, সেহেতু এটা একটা ছোটখাটো দাওয়াতে পরিণত হবে। প্লিজ আসবা।"

"আমার পর্যবেক্ষক চোখ কই পেলা?" হেসে উঠলেন মাহমুদুল হক।

"কথার কথা। আসবা কিন্তু।"

"ঝামেলায় ফেললে। আমি মাত্র বান্দরবান থেকে এলাম, একটু ঘুমাতাম কালকে।"

"বিকাল পর্যন্ত ঘুমিও, বিকালে আসো।" আদেশের মতো করে বলে ফোন কেটে দিলেন ফয়সাল মাহমুদ।

বাসায় ফিরে, তাঁর ঠিকানায় সবকিছু তখন স্বাভাবিক, রাত ততক্ষণে পৌনে নয়টা। গেটে বসে ছিল গার্ড ফখরুল, একমনে চিবুচ্ছিল পান। মাহমুদ সাহেবকে দেখে হাত নাড়ালো। "ঢাকার বাইরে ছিলেন, স্যার?"

"হুম।" মাহমুদ সাহেব চাবি ঘুরাতে ঘুরাতে উঠে গেলেন সিড়ি বেঁয়ে।

ঘরে সবকিছু ছিল আগের মত, এমনকি শোবার ঘরে উল্টানো সোফা পর্যন্ত আগের মতই পড়ে ছিল। জিনিসটা সর্তকভাবে আগের স্থানে দাঁড় করালেন, রাতে খাবার আর শক্তি ছিল না। টেবিলের ল্যাপটপে গান ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেন, বাতি নিভিয়ে সিগারেট ধরালেন। তাড়াহুড়ার মধ্যে চলে যাচ্ছে জীবন, এদিক-ওদিক তাকানোর সময় নেই। ঘুমাতে ভয় লাগছিল, যদি গোলাকার করিডোরের সেই স্বপ্নটা আবার দেখেন! চোখ বুজলেই যে দেখবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। অন্ধকার হয়ে থাকা ঘরজুড়ে নড়াচড়া করছিল বাইরের গাছপালার ছায়া, পড়ছিলো ল্যাম্পপোষ্টের আলো। মৃদু কণ্ঠে বেজে যাচ্ছিল রেকর্ড :

THEY, THEY... THEY BETRAY
I'M THE ONLY TRUE FRIEND NOW
THEY, THEY... THEY BETRAY
BUT I'M FOREVER THERE...

মার্কিন দেশে কেমন আছে শিরিন, তারও খোঁজ নেয়া হলো না আজকে। দেশ থেকে চলে গিয়েছিল আগের এক মামলার বাদী আকরামুল, তারই বা কী অবস্থা কে জানে। হয়তো ভালোই আছে, পশ্চিমে একবার আবাস গড়ে তুলতে পারলে কেউ কি আর খারাপ থাকে? আর কিছু না হোক, কিছু একটা করে খেতে পারে সবাই। বরং তার এই বন্ধু ফয়সাল মাহমুদ কেন যে বিদেশ চলে যাচ্ছে না, তাই তো আশ্চর্যের। সেনা থেকে অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার, তার তো সবকিছু হাতের মুঠোয়। শান্তিতে শেষ জীবনটা পার করতেন। এখন আবার মেয়ের বিয়ে দিতে যাচ্ছেন।

জানালার বাইরে ধীরে ধীরে জোরালো হল বাতাস। শরতের মাঝখানে এই হঠাৎ হঠাৎ দমকা বাতাসী বৃষ্টি হয়তো তেমনই কিছু। উৎকণ্ঠিত ডাক দিয়ে বসলো গাছের ডালে আশ্রয় নেওয়া পাখি। ছায়াগুলোর নড়াচড়া বেড়ে গেল, হাতের কাছে মাউস চেপে কমপিউটারের গান বন্ধ করলেন। এতক্ষণে চলে এসেছে ঘুম, বৃষ্টি হলে বরং ভালো জমবে গাঢ় করে।

***

কলাবাগানে ফয়সাল মাহমুদের বাড়িতে মাহমুদুল হক উপস্থিত হলেন বিকাল পাঁচটা দশে। সাধারণ পাঞ্জাবী পরলেন, সাজগোজ নেই। আয়োজন ভালোই, মেহমানরা সংখ্যায় সাতজন। ফয়সাল মাহমুদের স্ত্রী আয়শা ভাবি মাহমুদ সাহেবকে পেয়ে বিশেষ খুশি ছিলেন, পরিচয় করালেন তার ছোট বোন পূরবীর সাথে, যে ঢাকারই এক স্কুলে হেড শিক্ষিকা ছিলেন, আবার সনদপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাও ছিলেন। আরো ছিলেন ফয়সাল

সাহেবের চাকুরীর দিনগুলোর সাথী অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল মাতলুব, ছোটখাটো পেটমোটা, পুরু চশমার ভিতর বুদ্ধিদীপ্ত ধূসর চোখ চকচক করছিলো। বরপক্ষ আসতে আসতে মাগরিব ওয়াক্ত এসে গিয়েছিল, ততক্ষণে ভালো জমেছিলো আসর, নানা গল্পে।

বর-কনে'র দেখাদেখি হলো, ছেলেও ফয়সাল সাহবের মেয়ে খুশি'র মতই প্র্যাকটিসিং ডাক্তার। সোনায় সোহাগা, আর কী চাই। কারো *তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক চোখ* এখানে আর লাগেনি, বোঝাই যাচ্ছিল সামাজিক ষ্ট্যাটাস মেলানোটাই এখানে আসল ফ্যাক্টর। তা তো মিলে গেছে, তবে আর কী!

খাবার পর্ব আগেভাগে সারা হলো, রাত আটটায়ই সব পরিবেশন কমপ্লিট। রান্নাও ছিল মোটামুটি সাধারণ। মাহমুদ সাহেবের পাশের সিটে পড়ে গেলেন